বানানচর্চা

বাংলা বানান, প্রমিত উচ্চারণ ও ভাষারীতির গাইডবুক

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন কাসেমী
mmkasemi@gmail.com
mohiuddin kasemi//facebook.com

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

নির্ভুল বানান শেখার কিছু পরামর্শ ও প্রস্তাব—১১
বর্ণপরিচিতি —১৪
ব্যঞ্জনবর্ণের প্রকার ও প্রয়োজনীয় পরিভাষা—১৫
যুক্তাক্ষর পরিচিতি—১৬
একনজরে যুক্তব্যঞ্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা—১৭
যুক্তব্যঞ্জনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ—১৯
উচ্চারণের সূত্র—৩৪
ব দু'প্রকার—৪৩
যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপ—৪৩
সমধ্বনি যুক্তব্যঞ্জনযোগে গঠিত শব্দের বানান-পার্থক্য—৪৬
যুক্তব্যঞ্জন গঠনে চ-বর্গের পূর্বে ঞ (ইয়োঁ)—৫৯
যুক্তব্যঞ্জন গঠনে ট-বর্গের পূর্বে কেবল মূর্ধন্য-ণ—৬০
যুক্তব্যঞ্জন গঠনে ট-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন—৬০
যুক্তব্যঞ্জন গঠনে ত-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন—৬১
যুক্তব্যঞ্জন গঠনে চ-বর্গের পূর্বে শিস্‌ধ্বনি তালব্য-শ—৬৩
যুক্তব্যঞ্জন গঠনে ট-বর্গের পূবে শিস্‌ধ্বনি মূর্ধন্য-ষ—৬৩
যুক্তব্যঞ্জন গঠনে ত-বর্গের পূর্বে শিস্‌ধ্বনি দন্ত্য-স—৬৪
ঙ ং ঙ্গ—৬৬
হস্‌চিহ্ন এবং ঊর্ধ্বকমা—৬৯
বিসর্গ—৭০
ও এবং ও-কার—৭৩
রেফ (র্) প্রসঙ্গ—৭৭
বানানে য-ফলা (্য)—৮১
খণ্ড-ত (ৎ) আর আস্ত ত—৮৪
ক পাল্টে গ—৮৮

হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরযুক্ত শব্দের বানান—৯০
হ্রস্বস্বর ব্যবহারের ক্ষেত্র—৯১
ঈ-কার ব্যবহারের ক্ষেত্র—৯৫
উ, ঊ-কার এবং উ, ঊ-কার—৯৮
হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরযুক্ত শব্দের বানান-পার্থক্য—১০১
ণত্ব ও ষত্ব-বিধান—১০৯
স ব্যবহারের স্থান—১১৮
বানানে তালব্য-শ—১২১
সমোচ্চারিত শব্দের বানানে শ ষ স-জনিত অর্থ-পার্থক্য—১২৪
বানানে চন্দ্রবিন্দু (ঁ)—১২৯
পৃথক ও যুগ্ম শব্দ—১৩৬
র এবং ড়—১৪৮
-বান ও -মান—১৫৩
আরবি/উর্দু/ফারসির বাংলা প্রতিবর্ণ—১৫৮
বাংলা গণনা—১৬৪
সমার্থক বা প্রতিশব্দ—১৬৮
কবি-সাহিত্যিকদের নামের বানান—১৮৭
পুণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গের নামের পাশে সম্মানসূচক শব্দাংশ—১৮৮
যতি-চিহ্ন—১৮৯
সমোচ্চারিত শব্দের বানান ও অর্থের পার্থক্য—২০১
বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান—২০৬
পরিশিষ্ট- ১ : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতাবিধান– বিষয়ক জাতীয় কর্মশিবির (১৯৮৮)– এ গৃহীত বানানরীতি—২৬৩
পরিশিষ্ট- ২ : বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম—২৬৯
পরিশিষ্ট- ৩ : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি তৎসম শব্দের বানান—২৭৯
পরিশিষ্ট- ৪ : কলকাতা বিশ্বদ্যিালয় গৃহীত বাংলা বানানের নিয়ম—২৯১

নির্ভুল বানান শেখার কিছু পরামর্শ ও প্রস্তাব

১. বাংলা বানান লেখার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উচ্চারণ নির্ভর না হওয়া। (কিন্তু আরবি এর উল্টো; সেখানে অনেক ক্ষেত্রে মাখরাজ ও উচ্চারণ দিয়ে বানান লিখে ফেলা যায়)। কেননা, একই ধ্বনির বানান হরেক রকম হতে পারে। যেমন:

শিকার-স্বীকার, দর্শন-ধর্ষণ, মাংস-বংশ
বিশ্ব,হ্রস্ব, দৃশ্য, ভাষ্য, শস্য
অদ্রূপ, বহুল প্রচলিত উচ্চারণ সুষ্ঠ কিন্তু বানান সুষ্ঠু
উচ্চারণ জোতি কিন্তু বানান জ্যোতি ইত্যাদি।

২. শব্দকে হৃদয়ে অঙ্কিত করা, ছবির মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য করা। প্রায় বানানের পেছনে অবশ্যই ব্যাকরণগত যুক্তি আছে। কিন্তু আপনি যদি মুখস্থ রাখতে পারেন যে, এ বানান এভাবেই লিখতে হয়, তাহলে এত ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হবে না। যেমন : 'মুহূর্ত' বানানটি ছাত্ররা অবশ্যই শিক্ষাজীবনে অসংখ্যবার পড়েছে, দেখেছে। তারপরও লিখতে গিয়ে 'মুহুর্ত' লিখে। এর জন্য আমি মনে করি, কাছাকাছি উচ্চারণের শব্দগুলো একই বাক্যে পাশাপাশি ব্যবহার করে অনুশীলন করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। যেমন :
আপনার পকেট থেকে কিছু টাকা 'চুরি' হয়ে গেছে। আর এদিকে আমার বোনের হাতে 'চুড়ি' রয়েছে। তাই চুরি ও চুড়ির মাঝে বানানবিভ্রাটের সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং এমন শব্দগুলোকে একই বাক্যে ব্যবহার করে অনুশীলন করুন। এবং লিখুন :

গতরাতে আমার বোনের 'চুড়ি' 'চুরি' হয়ে গেছে।
আমি 'ঘোড়া'য় চড়ে ঢাকা 'ঘুরেছি'।
আমরা সবাই 'ঘুরি' কিন্তু 'ঘুড়ি' আকাশে উড়ে।
নদীর 'চরে' পুলিশের এক 'চর' তোমাকে 'চড়' মেরেছে।
'তোরা' শহিদ মিনারে ফুলের 'তোড়া' দিয়ে আয়।
একজন 'নারী' 'নাড়ির' টানে বাড়ি ফিরছে।
আমি দশ মিনিটে সুতিয়া নদী 'পাড়ি' দিতে 'পারি'।

এ ধরনের আরো বাক্য তৈরি করে অনুশীলন করুন, ইনশাল্লাহ আপনার বানান শুদ্ধ হতে শুরু করবে।

৩. অভিধানের সাহায্য নেওয়া

কোনো শব্দের বানানে সন্দেহ দেখা দিলেই আলসেমি কিংবা অনুমানের ওপর নির্ভর না করে সঙ্গে সঙ্গে অভিধান দেখুন এবং বানান সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। তবে কিছু শব্দ এমনও আছে যে, বারবার দেখার পরও তা মনে থাকে না। এক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দগুলো পেন্সিল বা লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখুন। ফলে প্রতিবার এ শব্দটি চোখে পড়বে এবং ভুল হওয়ার রোগটা সুস্থ হতে থাকবে।

৪. শব্দের আসল রূপ খুঁজে বের করা

এটি একটি চমৎকার নিয়ম। বানানে ভুল হওয়ার আশঙ্কা হলে শব্দটা কীভাবে তৈরি হয়েছে মাথা খেলিয়ে তার আসল রূপ খুঁজে বের করুন। ধরুন, 'ভূগোল' শব্দের বিশেষণ প্রায় সবাই লেখে 'ভৌগলিক'। অথচ এটা ভুল। মূল শব্দের 'গো' বিশেষণে 'গ' হবে কেন? সুতরাং শুদ্ধভাবে লিখুন- 'ভৌগোলিক'।

৫. শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ শিখুন, অন্যথায় এর প্রভাব বানানে গিয়ে পড়বে। যেমন : অনেকেই বলেন, অত্যান্ত, আশ্চার্য, মুখস্ত, ঘনিষ্ট এবং লেখেনও তাই। অথচ শব্দগুলো হবে- অত্যন্ত, আশ্চর্য, মুখস্থ, ঘনিষ্ঠ।

৬. কঠিন বানানের তালিকা

যে বানান বারবার লিখতে গিয়েও ভুল করছেন কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ছেন এমন কঠিন বানানের একটি তালিকা করে সেগুলো জব্দ করুন। মাঝে মাঝে লিখে এবং বাক্যে প্রয়োগ করে প্র্যাকটিস করুন।

৭. খুঁটে খুঁটে পড়ার অভ্যাস গড়ুন

আমরা প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু পড়ি। দৈনিক পত্রিকা থেকে নিয়ে বিলবোর্ড পর্যন্ত। সবকিছু খুঁটে খুঁটে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। পঠিত শব্দগুলোর বানানের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখুন। নিশ্চিত শুদ্ধ হলে ভালো কথা। একটু সন্দেহ হলেই অভিধান কিংবা বিজ্ঞজনের সাহায্যে তা ঠিক করে ফেলুন।

৮. নতুন নতুন শব্দ শেখা

মানুষ যেমন প্রতিনিয়ত অর্থসঞ্চয়ের ধান্ধায় থাকে; তদ্রূপ শিক্ষার্থীদের উচিত,

কোথাও কোনো নতুন শব্দ নজরে পড়লেই তা শুদ্ধভাবে লিখে শিখে নিবে। প্রয়োজনে শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রও আয়ত্ত করবে। কারণ, কোনো শব্দ ভুল শেখা হয়ে গেলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

৯. বানানের নিয়মকানুন আয়ত্ত করে মেনে চলা

একেক শব্দের একেক বানান। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের বানান-ই কোনো-না-কোনো নিয়মকানুনের আওতায় পড়ে। তাই সে নিয়মগুলো মেনে চললে নিঃসন্দেহে আপনি বানানে দক্ষ হয়ে উঠবেন। যেমন : ট বর্গের আগে সর্বদা ষ হয়। যথা- মিষ্টি, বৃষ্টি, সৃষ্টি; তবে বিদেশি শব্দে স হবে। সুতরাং লিখুন - স্টোর, স্টেট, টেস্ট, পেস্ট, মাস্টার, পোস্টার, স্টেশন, খ্রিস্টান/খৃস্টান। কিন্তু ষ দিয়ে লিখবেন না। যদিও আপনার চারপাশে ষ দিয়েই লেখছে মানুষ। এটা ভুল।

১০. অবশেষে বলব, নিয়মতান্ত্রিক চর্চা ও অনুশীলন না করলে কোনো বস্তুই অর্জন করা মুশকিল। ঠিকভাবে পড়া, আবৃত্তি করা রীতিমতো প্রশিক্ষণের মুখাপেক্ষী। আর ভালো লেখা— সে তো জীবনব্যাপী সাধনার ধন; নইলে লেখক হওয়া এত কঠিন কেন?

তাই আপনি নিয়মিত অধ্যয়ন করুন। বস্তাপচা লেখা পড়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।

বর্ণপরিচিতি

মানুষ মুখের মাধ্যমে বলে কিংবা কলমের সাহায্যে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যেসব সঙ্কেত সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোকে বর্ণ বলে। এককথায়, ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলা হয়।

বর্ণ দুই প্রকার– স্বর ও ব্যঞ্জন

যেসব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারণ করা যায় তাকে স্বরবর্ণ বলে।

স্বরবর্ণ ১১টি। যথা :

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৪০টি। যথা :

ক খ গ ঘ ঙ;

চ ছ জ ঝ ঞ;

ট ঠ ড ঢ় ঢ ঢ় ণ;

ত ৎ থ দ ধ ন;

প ফ ব ভ ম;

য য় র ল;

(অন্তঃস্থ)ব শ ষ স হ; ং ঃ ঁ

মাত্রা

বাংলা বর্ণসমূহের ওপর যে 'দাগ' আছে তাকে 'মাত্রা' বলে। বাংলা বর্ণমালাকে মাত্রা হিসেবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. মাত্রাহীন বর্ণ, তা দশটি, যথা : এ ঐ ও ঔ ঙ ঞ ৎ ং ঃ

২. অর্ধমাত্রাবর্ণ, তা আটটি, যথা : ঋ খ গ ণ থ ধ প শ

৩. পূর্ণমাত্রাবর্ণ, তা তেত্রিশটি, যথা : অ আ ই ঈ উ ঊ; ক ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ় ঢ ঢ় ত থ দ ন ফ ব ভ ম য য় র ল ষ স হ

বর্ণপ্রকরণ

উচ্চারণের স্থান হিসেবে স্বরবর্ণকে এভাবে ভাগ করা যায় :

অ, আ – কণ্ঠ্য	ঋ – মূর্ধন্য
ই, ঈ – তালব্য	উ, ঊ – ওষ্ঠ্য
এ, ঐ – কণ্ঠ্যতালব্য	ও, ঔ কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্য

ব্যঞ্জনবর্ণের প্রকার ও প্রয়োজনীয় পরিভাষা

ক হতে ম পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে। জিহ্বার সাথে মুখের বিভিন্ন অংশের অথবা ওষ্ঠের সাথে অধরের স্পর্শ দ্বারা এ বর্ণগুলো উচ্চারিত হয়, তাই এগুলির নাম 'স্পর্শবর্ণ'।

পঁচিশটি বর্ণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগের নাম 'বর্গ'। বর্গে প্রথম বর্ণের নামানুসারে বর্গের নাম হয়। তাছাড়া উচ্চারণের সময় জিহ্বা কিংবা অধর দ্বারা স্পৃষ্ট স্থানের নামানুসারেই এদের কণ্ঠ্য, তালব্য ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যথা :

ক - বর্গ	ক খ গ ঘ ঙ; – কণ্ঠ্যবর্ণ
চ - বর্গ	চ ছ জ ঝ ঞ; –তালব্যবর্ণ
ট - বর্গ	ট ঠ ড [ড়] ঢ [ঢ়] ণ; – মূর্ধন্যবর্ণ
ত - বর্গ	ত [ৎ] থ দ ধ ন; – দন্ত্যবর্ণ
প - বর্গ	প ফ ব ভ ম; –ওষ্ঠ্যবর্ণ

এই স্পর্শবর্গ পাঁচটির মধ্যে প্রতি বর্গের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম– এ পাঁচটি বর্ণকে নাক দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় বলে এদের অনুনাসিকবর্ণ বা নাসিক্যধ্বনি বলে।

প্রতি বর্গের প্রথম চারটি বর্ণে অনুনাসিক উচ্চারণ বুঝাতে সে বর্ণের পঞ্চম বর্ণটি যোগ করতে হয়। অর্থাৎ ক-বর্গের চারটি (ক খ গ ঘ) বর্ণের অনুনাসিক ধ্বনিতে 'ঙ' যুক্ত হবে। অন্য কোনো নাসিক্যবর্ণ আসবে না। যেমন– অঙ্ক, শঙ্ক, গঙ্গা, সঙ্ঘ। তদ্রূপ চ-বর্গে 'ঞ' (চঞ্চল, লাঞ্ছনা, ঝঞ্ঝা); ট-বর্গে 'ণ' (বণ্টন, লুণ্ঠন, তাণ্ডব, ইত্যাদি); ত-বর্গে 'ন' (অন্ত, পন্থা, মন্দ, বন্ধক); প-বর্গে 'ম' (কম্পন, লম্ফন, লম্বা, আরম্ভ)।

বি. দ্র. ড় ঢ় এর সাথে 'ণ' যুক্ত হয় না; এবং ঢ এর সাথেও খুব কম মিলিত হয়, যা না হওয়ার পর্যায়ে। আর ত বর্গে ৎ এর সাথে 'ন' যুক্ত হয় না।

ঘোষ ও অঘোষ বর্ণ

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে ঘোষ অর্থাৎ ধ্বনির গাম্ভীর্য অল্প থাকার কারণে এগুলোকে 'অঘোষবর্ণ' বলে। ক খ চ ছ ট ঠ ত প ফ এবং ষ স– এই বর্ণগুলি অঘোষবর্ণ।

আর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের ধ্বনির গাম্ভীর্য বেশি থাকার কারণে এগুলোকে বলা হয় ঘোষবর্ণ বা নাদবর্ণ। গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম, য র ল ব হ এবং সকল স্বরবর্ণ হচ্ছে ঘোষবর্ণ।

শ, ষ, স – এই তিনটি এবং হ উচ্চারণ করতে একই শিস্‌ধ্বনি আসে বলে এদের নাম 'উষ্মবর্ণ'।

য, র, ল, ব – এই চারটি বর্ণকে অন্তঃস্থবর্ণ বলে। কেননা, ক হতে ম পর্যন্ত স্পর্শবর্ণ। সুতরাং 'র' বর্ণের নাম অন্তঃস্থ-ব, ব-য়ে শূন্য-র বলা ভুল। এবং শ, ষ, স – এই তিনটি উষ্মবর্ণের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যবর্তী এই চারটি বর্ণ।

ং (অনুস্বার) – অনুনাসিক ধ্বনি। বাংলা উচ্চারণ 'ঙ'-এর মতো।

ঃ (বিসর্গ) – তা 'ই' বর্গেরই একটি রূপান্তর। একটু পার্থক্য হচ্ছে, 'ই' হলো ঘোষধ্বনি। বাংলাতে শব্দের শেষে 'ঃ' উচ্চারিত হয় না। যথা : বিশেষতঃ, ফলতঃ ইত্যাদি। মধ্যবর্তী বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করে। যথা : দুঃখ (দুক্‌খো) ইত্যাদি।
(বিসর্গ নিয়ে স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা রয়েছে।)

ঁ (চন্দ্রবিন্দু) –স্বরধ্বনির অনুনাসিক দ্যোতনা করে। যথা : চাঁদ, পাঁচ ইত্যাদি।

যুক্তাক্ষর-পরিচিতি

ওপরে আমরা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকৃতি দেখেছি। কখনো শব্দের মধ্যে বর্ণের এই আকৃতি হুবহু ঠিক থাকে। যেমন- বল, কল, নল ইত্যাদি। এ বিষয়টি স্পষ্ট; ব্যাখ্যা করে বুঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আবার কখনো একবর্ণ অন্য বর্ণের সাথে মিলিত হয়ে শব্দ গঠিত হয়; তখন প্রায় বর্ণের আসল রূপ ঠিক থাকে না। একবর্ণ যখন অন্য বর্ণের সাথে মিলিত হয় সে বর্ণকে যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর বলে। আর জেনে রাখা দরকার, বাংলা শব্দ শুদ্ধভাবে লিখতে হলে সর্বাগ্রে যুক্তাক্ষর চিনতে হবে।
ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ যুক্ত হলে আমাদের চিনতে অসুবিধে হয় না। কারণ, সেগুলো আমরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত। 'গান' শব্দে যে গ্‌ (ব্যঞ্জনবর্ণ) এর সাথে 'আ' স্বরবর্ণ মিলে 'গা' যুক্তবর্ণ তৈরি হয়েছে, তা আমাদের মনেই পড়ে না। স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন স্বরবর্ণগুলো স্বীয় রূপ পাল্টায়। যেমন-

আ হয়ে যায় আ-কার া (কাকা)
ই ,, ,, হ্রস্ব ই-কার ি (চিঠি)

ঈ	,,	,,	দীর্ঘ ঈ-কার ী	(বীণা)
উ	,,	,,	হ্রস্ব উ-কার ু	(মরু/মরু)
ঊ	,,	,,	দীর্ঘ ঊ-কার ূ	(রূপা/রূপা)
ঋ	,,	,,	ঋ-কার ৃ	(তৃণ/হৃদয়)
এ	,,	,,	এ- কার ে	(কে)
ঐ	,,	,,	ঐ-কার ৈ	(বৈ)
ও	,,	,,	ও-কার ো	(কোমল)
ঔ	,,	,,	ঔ-কার ৌ	(ভৌতিক)

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, স্বরবর্ণের এ চিহ্নগুলো কখনো ব্যঞ্জনবর্ণের ডানপাশে (া,ী); কখনো বা পাশে (ি, ে, ৈ); কখনো উভয় পাশে (ো, ৌ); আবার কখনো নিচে (ু , ূ ,ৃ) স্থান নেয়। তবে এ ধরনের যুক্তবর্ণ চিনতে ও বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধেই হয় না। কারণ, প্রায় প্রতিটি শব্দেই ব্যঞ্জনবর্ণ + স্বরবর্ণের (যেমন- ক্ + আ = কা) সংযোগ থাকে বলে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সত্যি বলতে কি, এ প্রকার যুক্তবর্ণ বাদ দিয়ে বাংলার প্রায় কোনো শব্দই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হয়ে নতুন যে যুক্তবর্ণের সৃষ্টি হয় তাতেই একটু ঝক্কি-ঝামেলা। কেননা, তার আকৃতি-অবয়ব নানান ধাঁচের, উচ্চারণও হরেক রকমের। বাংলাতে যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা আড়াইশোর অধিক। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করছি।

একনজরে যুক্তব্যঞ্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা

যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম বর্ণ	দুই বর্ণের যুক্তব্যঞ্জন	তিন বর্ণের যুক্তব্যঞ্জন	চার বর্ণের যুক্তব্যঞ্জন
ক	ক্ক ক্ট ক্ত ক্ম ক্য ক্র ক্ল ক্ব ক্ষ ক্স	ক্ষ্ণ ক্ষ্ব ক্ষ্ম ক্ষ্য	
খ	খ্র খ্য		
গ	গ্ণ গ্ধ গ্ধ্য গ্ধ্র গ্ন গ্ব গ্ম গ্য গ্র গ্ল	গ্ন্য গ্র্য	
ঘ	ঘ্ন ঘ্র ঘ্য		
ঙ	ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ম ঙ্ক্ত ঙ্ক্র	ঙ্ক্ষ ঙ্গ্য ঙ্ঘ্য ঙ্ঘ্র	
চ	চ্চ চ্ছ চ্ঞ চ্য	চ্ছ্য চ্ছ্র	
জ	জ্জ জ্ঞ জ্য জ্র জ্ব	জ্জ্ব	
ঞ	ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞ্চ		
ট	ট্ট ট্ব ট্ম ট্য ট্র		
ঠ	ঠ্য		